আমার ছবিকথা

তুহিন শুভ্র

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার বই পড়েছিলাম ‘ছবি আঁকে, ছিড়ে ফ্যালে’ নামে। বইটি না পড়েই মনে প্রশ্ন জেগেছিল কে ছবি আঁকে? আর আঁকেই যখন ছিঁড়েই বা ফ্যালে কেন? কবিতার বইয়ের নামকরণের মধ্যেই পাঠকের মনযোগ তৈরি হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। অনেক পরে, বড় হয়ে জেনেছিলাম নামকরণের গূঢ় তাৎপর্য। একজন ছবি আঁকিয়ে তাঁর ছবি আঁকার সময় যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন, অর্থাৎ, শিল্প নির্মাণের সময় একজন শিল্পী কেবল শিল্পের কাছেই দায়বদ্ধ। তেমনি তাঁর আঁকা ছবি নিয়ে তিনি কী করবেন – বাঁধিয়ে রাখবেন, বিক্রি করবেন, দান করবেন, পুড়িয়ে ফেলবেন, নাকি ছিঁড়ে ফেলবেন, সেটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। মোটকথা, একজন শিল্পী, ঈশ্বরের মতোই, সৃষ্টি ও বিনাশের ব্যাপারে একচেটিয়া স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। আর এই কারণেই শিল্প কারও দাসত্ব করেনা। ঝর্ণার মতো শিল্প সততই প্রবাহমান। তা সে সাহিত্যই হোক, সঙ্গীত, কিংবা চিত্রচর্চা।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমার ছবি আঁকতে ভালোলাগত। ছোটবেলাতে ছবি আঁকার প্রতি সবার যেমন ঝোঁক থাকে, তেমনই। তবে সেসব ছবিগুলিকে ছবি না বলে আঁকিবুকি বলাই ভালো। সহজপাঠে প্রথম ছবির সাথে পরিচয় ঘটল। “বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি। জলে থাকে মাছ। ডালে আছে ফল। পাখি ফল খায়। পাখা মেলে ওড়ে।” একটি ছোট্ট বৃত্তাকার পরিসরে, সাদাকালোয় এতগুলো ঘটনার ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেই আমার প্রথম ছবি দেখা। ছবি দেখে আনন্দ পাওয়া। আর সেই আনন্দে একের পর এক ছবি দেখে দেখে আঁকতে চেষ্টা করা। অনেক পরে জেনেছিলাম সহজপাঠের মাহাত্ম্য। জেনেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাগুলিকে ছবি দিয়ে যত্ন করে সাজিয়েছিলেন নন্দলাল বসু। সেদিন অনেকের মতো, আমারও ছিল শৈশবজুড়ে কেবলই সহজপাঠের মিষ্টি দৌরাত্ম্য।

সহজপাঠময় নির্মল শৈশব একদিন শেষ হল। কৈশরের শেষভাগে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরের বড় স্কুলে। সেখানে 'ড্রয়িং টিচার' হিসাবে পেলাম পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীকে। তিনি স্নেহের রঙে তুলি চুবিয়ে আমার মনে এঁকে দিলেন ভালোবাসার ছবি। তাঁর কাছেই প্রথম শুনলাম অজন্তা, ইলোরা গুহাচিত্রের রোমহর্ষক গল্প। আদিম মানুষের প্রথম ছবি আঁকার কাহিনী। কী আশ্চর্যভাবে বাইসনের দুর্বার আস্ফালন গুহার দেয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন কোন এক প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী। বিদেশী চিত্রকলার সাথে পরিচয় ঘটল তাঁর হাত ধরেই। দেখা হয়ে গেল পৃথিবীর বেশকিছু বিখ্যাত 'মাস্টারপিস'। 'দি লাস্ট সাপার', 'মোনালিসা'-র সাথে পরিচয় হল। এদের মধ্যে 'দি লাস্ট সাপার' ভীষণ দাগ কাটল মনে। ছবির নান্দনিক উৎকর্ষতা বা গুণমান বিচার করার ক্ষমতা আমার তখনও ছিলনা, এখনও নেই।

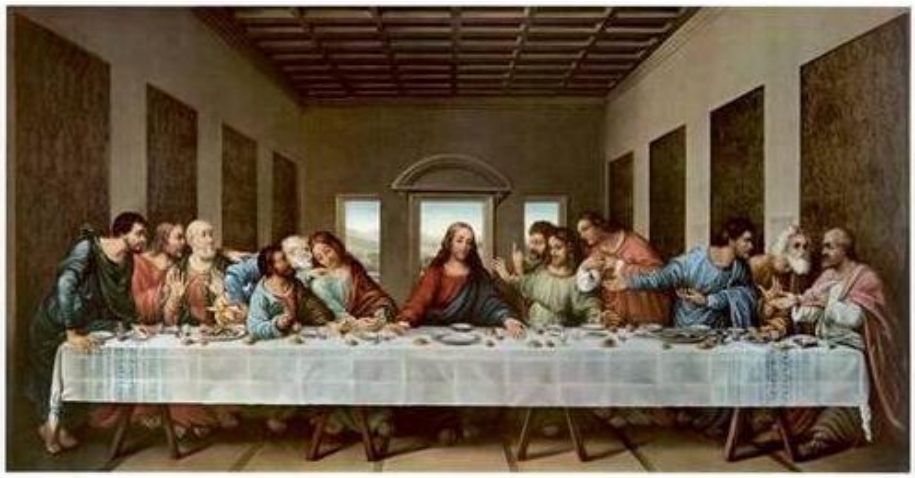

কেবল ছবি দেখতে ভালো লাগে। আর ছবির পিছনের গল্পটিকে খুঁজতে ভালো লাগে। সবসময় যে কোনো গল্প খুঁজে পাওয়া যায়, তা-ও নয়। তবুও খুঁজে চলার নিরন্তর প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। আর এ গল্প খোঁজার অভ্যাসটি আমার শিক্ষকমশাই আমার মধ্যে আমার অজান্তেই হয়তো গুঁজে দিয়েছিলেন। 'দি লাস্ট সাপারের' গল্পটা শোনানোর পর স্যার আমাদের বিশ্বাসঘাতক জুডাসকে ছবির মধ্যে খুঁজে বার করতে দিয়েছিলেন মনে পড়ে। নিওনার্দো চেনা হলে মিকেলাঞ্জেলো চিনলাম। চিনলাম তাঁর 'ম্যাডোনা' ও 'ডেভিড'-কে। এভাবেই একে একে চিনেনিলাম গগনঠাকুর, অবনঠাকুর, যামিনী রায়, নন্দলাল বসুকে। দেখে মুগ্ধ হলাম নন্দলাল বসুর রেখায় রেখায় রূপের আদল 'রূপাবলী'। গগনঠাকুরের আলো-আঁধারী খেলা। আর অবনঠাকুরের সেই বিখ্যাত 'লাস্ট জার্নি'। দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে আসা এক পরিশ্রান্ত উট যে চলার শক্তি হারিয়েছে। মাথা নুয়ে এসেছে মাটিতে। হয়তো সে অন্তিম মুহূর্তের

অপেক্ষায় প্রহর গুনছে কিংবা বাকি পথটুকু অতিক্রমের জন্য শেষ জীবনিশক্তিটুকুকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। এগুলোই আমার প্রিয় ছবি। আজ বলতেই পারি, সেইসব ছবি আমার ভালো লাগে যা কোনো না কোনো গল্প বলে। কিংবা ছবি হয়ে ওঠার পটভূমিটাকে খুঁজে নিতে দর্শককে বাধ্য করে যে সব ছবি, সে ছবিই আমার মুখ্য আকর্ষণ। তা সে নিসর্গচিত্রই (landscape) হোক কিংবা মানুষের মুখের ছবি (portrait)। কেননা গল্প শুনতে শুনতেই আমার ছবি দেখার পাঠ শুরু। আর ছবি দেখতে দেখতেই একটি ছবি হয়ে ওঠার গল্প শোনা।

তাই আমার ফেলে আসা দৈনন্দিন যাপনকে ঘিরে রয়েছে সেইসব ছবি আর গল্পের যুগলবন্দী। কখনও সেটা দিনপঞ্জীর পাতায় পুরাণের টুকরো গল্পে। কখনও পাঁচালীর ব্রতকথায়। কখনও বা পটের গানে। আজ এভাবেই আমার কাছে ছবি হয়ে গেছে শোনার, গল্প হয়ে গেছে দেখার। আর এই অমোঘ উলোটপুরান যিনি অনিবার্যভাবে ঘটিয়ে দিয়েছেন তিনি আমার শিক্ষক শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী – আমার ছবির মানুষ, আমার গল্পের মানুষ, আমার কৈশোর-যৌবনের একান্ত নন্দলাল বসু।

প্রথম ছবি: সহজপাঠ থেকে নন্দলাল বসু; দ্বিতীয় ছবি: লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ‘দা লাস্ট সাপার’; তৃতীয় ছবি: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দা লাস্ট জার্নি’